বৃহস্পতিবার ৩০ চৈত্র,১৪২৩
বর্ষ : ১২, সংখ্যা ১১৫

ফাঁসি নয়, কুলভূষণের মুক্তি চাই, দেশজুড়ে এই দাবি উঠুক

পাক সেনা আদালতের ফরমানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক কুলভূষণ সুধীর যাদবের মুক্তির দাবিতে সংসদে সব দল যেভাবে এক সঙ্গে প্রতিবাদে সরব হয়েছে তা সময়োচিত। এই এককাট্টা জোরালো প্রতিবাদের দরকার ছিল। কুলভূষণকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এই বার্তা অনুরণিত হোক ইসলামাবাদের সব প্রান্তরে। একই সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। এটা অত্যন্ত আশাজনক যে পাক সেনা হেফাজত থেকে কুলভূষণের মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র, এই উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সংসদের দুই কক্ষেই মঙ্গলবার ঝাঁঝালো বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে প্রথার বাইরে গিয়েও কুলভূষণের জীবন রক্ষার জন্য লড়াই করবে ভারত। বিদেশমন্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন, কুলভূষণ শুধু তার পিতা-মাতার সন্তান নয়, গোটা হিন্দুস্তানের সন্তান। এই মনোভাব আমাদের সকলের থাকা দরকার। তবে পাক চালাকি ও ষড়যন্ত্রের এ ব্যাপারে কোনও বিরাম নেই। ভারত বলেছে, কুলভূষণ সুধীর যাদবকে পরিকল্পনা মাফিক হত্যার চেষ্টা করছে ভারত। ভারতের এই অভিযোগ নস্যাৎ করতে তৎপর পাকিস্তান। পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফের দাবি, কুলভূষণের বিচার আইন মেনেই হয়েছে। তাতে তিন মাস সময় লেগেছে। কিন্তু পাকিস্তানের বিরোধী দল পিপিপি নওয়াজ সবকারকে খোঁচা দিয়েছে। তারা বলেছে, বিষয়টি বিতর্কিত। তবে তারা নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। এসব সত্ত্বেও কুলভূষণের ফাঁসি হলে পাকিস্তানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে ওই দেশকে একঘরে করতে হবে। এটাই চায় দেশবাসী।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

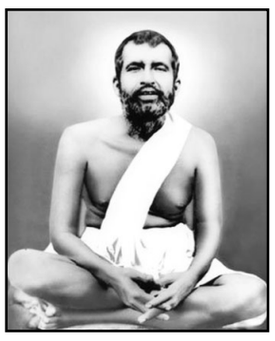

লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে?

ভক্ত—আজ্ঞা, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সদসৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটি সর্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত—আজ্ঞে, সময় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে।

''যারা একান্ত পারবে না তারা দু'বেলা খুব দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্যামী,—বুঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাক্‌বার সময় নাই,—তাকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও। কিন্তু তাকে লাভ না করলে—তাকে দর্শন না করলে, কিছুই হল না।''

একজন ভক্ত—আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড়লোক, আমি অমুক—এই সব অহঙ্কার না গেলে তাকে পাওয়া যায় না। 'আমি' টিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি ক'রে ফ্যালো।

(কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ)

ভক্ত—সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। তার ইচ্ছা। তার মায়া! কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত—কেন ভুলিয়ে রেখেছেন?কেন, তার ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তা হলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না।

''চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। **(ক্রমশ)**

দিন পঞ্জিকা

৩০ **চৈত্র**, ভাঃ ২৩ চৈত্র, **১৩ এপ্রিল**, ৩০ চ'ত, সংবৎ ২ বৈশাখ বদি, ১৫ রজব। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৩। **বৃহস্পতিবার**, তৃতীয়া রাত্রি ঘ ২।৪০ মিঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৪৫ মিঃ। বৈধৃতিযোগ দিবা ঘ ১।৩০ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৩।৪৫ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ২।৪০ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ১১।৪৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **যোগিনী**—অগ্নিকোণে, রাত্রি ঘ ২।৪০ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি** ঘ ২।৪৫ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৪২ গতে ১।১১ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**– দীক্ষা। **বিবিধ**-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন । **শ্রীশ্রী গৌরী তৃতীয়া ব্রত।** গোস্বামিমতে তৃতীয়াকল্পে **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব। সারহুল উৎসব** (বিহার)। **শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা** (বৈধৃতিযোগদোষ) রাত্রি ঘ ২।৪০ মধ্যে মন্বন্তরা স্নানাদানাদি ও অনধ্যায়। **মাহেন্দ্রযোগ**-দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—রাত্রি ঘ ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৩০ **চৈত্র**, ভাঃ ২৩ চৈত্র, **১৩ এপ্রিল**, ১৫ রজব, ৩০ চ'ত্, উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫২,বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দি ঘ ১১।৪৩, সেহরী শেষ ৩।৫৮, ইফতার ৬।০০।

মাদককে 'না' বলুন
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

নির্বাচনী সংস্কারে রাষ্ট্রপতির আহ্বানকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত

লোকসভা ভোটের আগেই রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন

কল্যাণী শঙ্কর

শনিবার এক অনুষ্ঠানে অতি দরকারি নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মুখ খুললেন। নির্বাচনের কিছু ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি রয়েছে, তার সংস্কার দরকার বলে তিনি ইঙ্গিত করেন। এমনকি দেশের প্রধান বিচারপতিও সম্প্রতি বলেছেন, নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে রাজনৈতিক দলগুলির দায়বদ্ধতা দরকার।

ভোটে স্বচ্ছতার স্বার্থে রাষ্ট্রপতির মন্তব্য সময়োচিত। কারণ, বড় রকমের নির্বাচনী সংস্কার দীর্ঘকাল ধরেই বকেয়া রয়েছে। বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, গুরুত্বপূর্ণ তামিলনাড়ুর আর কে নগর উপনির্বাচন কমিশন স্থগিত করে দেওয়ায়। গত ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতার মৃত্যুতে খালি হওয়া যে আসনে ভোটের সময় শশীকলাপন্থীরা ভোটার কিনতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছড়াচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠায় এমন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে বহু বছর ধরে কথা হচ্ছে। গঠিত হয়েছে বহু কমিটি। ১৯৯০ সালে গোস্বামী কমিটি, ১৯৯১ সালে ভোহরা কমিটি, ১৯৯৮ সালে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি, ১৯৯৯ সালে ল কমিশন, ২০০১ সালে ন্যাশনাল কমিশন এই দায়িত্ব পেয়েছিল। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াও ২০০৪ সালে সংস্কারের কথা বলেছিল। তারপরেও সেকেন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন যে রিপোর্ট বানিয়েছিল, সেগুলির উপর কেবল ধুলো জমছে। ভোটে অর্থ ও পেশিশক্তির আস্ফালন বন্ধ করতে কমিটিগুলি বহু পন্থার প্রস্তাব করেছে। ভোহরা কমিটি বলেছিল, বহু রাজনৈতিক নেতা আসলে কোনও গ্যাং বা সশস্ত্র সেনার নেতা হিসাবে বহু বছর ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম নিচু স্তরে জিতে তারপর বিধানসভা হয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সংসদে। এমনকি কমিশন যে আদর্শ আচরণ বিধি তৈরি করেছে, তা কার্যকর হচ্ছে না নির্বাচন কমিশনের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকায়।

কমিশন তার দীর্ঘ সংস্কারের তালিকা কার্যকর করার জন্য বহু বছর অপেক্ষায় রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি এই বছরের ৩১ মার্চ এক ইংরেজি সংবাদপত্রে লিখেছেন, কমিশনের প্রস্তাবগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিচ্ছন্নতা। যার দ্বারা অপরাধে কালিমালিপ্ত নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ কেড়ে নেওয়া যাবে। আর্থিক শক্তিকে আটকানো সম্ভব হবে। অস্তিত্বহীন এবং সন্দেহজনক রাজনৈতিক দলগুলিকে আবর্জনা হিসাবে ছুঁড়ে ফেলার ক্ষমতা প্রদান করা হবে কমিশনকে। দুই, কমিশনকে আরও শক্তিশালী এবং স্বাধীন করা হবে। যাতে ইলেকশন কমিশনারদের নির্বাচন হবে কলেজিয়াম ব্যবস্থা দ্বারা। সিইসিতে তাদের উত্থান হবে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে। যাদের একমাত্র ইম্পিচমেন্ট দ্বারা সরানো সম্ভব হবে। তিন, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে হতে হবে আরও কার্যকর। কোনও পোলিং বুথের ভোটিং প্যাটার্ন যাতে প্রকাশ না পায়, তার জন্য করতে হবে বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার। এছাড়াও কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরও ক্ষমতা চায়।

ভোটের সময় কালো টাকার ব্যবহার বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। কমিশন যে অর্থ বরাদ্দ করে তার কয়েকশত গুণ প্রার্থীরা ভোটে উড়িয়ে দেন। রাষ্ট্রীয় খরচে ভোট করার প্রস্তাব বহু কমিটি দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে কমিশন বাজেয়াপ্ত করেছে প্রায় ৩০০ কোটি হিসাব বহির্ভূত টাকা, ১৭ হাজার কিলোগ্রামের বেশি মাদক, বিপুল পরিমাণ মদ এবং অস্ত্র। বর্তমানে সব দলগুলির মোট নির্বাচনী ব্যয়ের ৭০ শতাংশ অর্থ আসে অজানা, অজ্ঞাত সূত্র থেকে। ল' কমিশনও সন্দেহজনক নির্বাচনী দান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে দলগুলি ৫০০ কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছিল ভোটে লড়ার জন্য। সাম্প্রতিক বাজেটে সরকার এক পদক্ষেপে জানিয়েছে, কোনও দাতার থেকে দুই হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। মোদী সরকার নির্বাচনী বন্ডের যে পরিকল্পনা করেছে, তার দ্বারা ভোটে কালো টাকা যতটা কাজে লাগানো যাবে, নির্বাচনী সংস্কারে ততটা কাজে আসবে না। রাষ্ট্রীয় খরচের ব্যাপারে নির্বাচনী কমিশন সর্বদাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে রাজনীতিতে অপরাধীদের অবাধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইনি ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় একইসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের কথা বলছেন। যাতে ভোটে কেন্দ্রের খরচ কমবে। এর জন্য কেন্দ্র, রাজ্যগুলি এবং নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে বসে সমাধান সূত্র খুঁজতে পারে। কারণ, স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশক এইভাবেই ভোট হয়েছিল। সাতের দশক থেকে লোকসভা ও বিধানসভার ভোটের সময় বদলে যেতে থাকে। এছাড়া দীর্ঘকাল ধরে দফায় দফায় ভোট হওয়া নিয়েও কথা হচ্ছে। এমনকি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমানের ৫৪৩ থেকে বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের যথাযথ মনোবাঞ্ছাকে মর্যাদা দিতে লোকসভা আসনগুলির পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা দরকার। যাতে আসন সংখ্যা বাড়ে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, লোকসভা আসনগুলির পুনর্বিন্যাস হয়েছে ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী। ভারতে মোট ভোটারের সংখ্যা এখন ৮০ কোটির বেশি। এদিকে মহিলাদের জন্য লোকসভা সহ বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি উঠেছে। রাজ্যসভা এই প্রসঙ্গে ২০১০ সালে ৭ মার্চ মহিলা সংরক্ষণ বিল অনুমোদনও করেছিল। যদিও লোকসভায় তা বাতিল হয়। সম্প্রতি সংসদে নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিগত ৭০ বছর ধরে নানা বাধা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা চলছে। সেখানে এমন সংস্কার গণতন্ত্রকেই আরও জোরদার করবে। তাই আগে হোক বা পরে এমন পদক্ষেপ দরকার।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ভারতের নারীদের ক্ষমতায়ন

কমলা ভাসিন

নীতি বিবৃতিগুলি এখন মেয়েদের প্রতি বেশ সংবেদনশীল। সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও কর্মসূচিতে বাড়ছে অংশগ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা। পঞ্চায়েতেও এখন আগের চেয়ে বেশি মহিলাদের নির্বাচিত হতে দেখা যাচ্ছে। লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য সরকার গড়ে তুলেছে মহিলা কার্যালয়, আয়োগ, দফতর, মন্ত্রক। নারী-পুরুষ সমতার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে অবশ্য আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

(ক্ষমতায়ন এক গতিশীল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া)

নারী-পুরুষ সমতার দিশায় এগোনোর জন্য ক্ষমতাহীন লিঙ্গ, অর্থাৎ মহিলা ও কন্যাসন্তানদের ক্ষমতা দিতে হবে। কাউকে ক্ষমতা দিতে গেলে, ক্ষমতা জিনিসটা ঠিক কী, তা আগে বোঝা দরকার। অপরবশ হয়ে উদ্যোগ নেওয়ার সামর্থ্যই হচ্ছে ক্ষমতা, অন্যদের নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করার সামর্থ্যই হল ক্ষমতা। ক্ষমতার অর্থ স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ বাছাই, বক্তব্য পেশের সুযোগ আয়ত্ত করা।

মানব সমাজে ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বিষয়সম্পত্তি ও ধ্যান ধারণার উপর নিয়ন্ত্রণ। বিষয়-আশায় ও ভাবাদর্শের (মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা ব্যবস্থা ইত্যাদি) নিয়ামকরাই হয়ে ওঠেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী এবং পরিবার, গোষ্ঠী ও দেশের হর্তাকর্তা।

মহিলাদের ক্ষমতা বাড়াতে, তাই পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও কাঠামোয় রদবদল দরকার। সম্পদে (প্রাকৃতিক, মানবীয়, বৌদ্ধিক, আর্থিক, আত্মিক) মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কায়েম এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি।

আমার মতে, ক্ষমতা সম্পর্কে এখনকার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন আমাদের জীবনের মান উন্নত করবে।

আমাদের ক্ষমতায়ন মানে অন্যের উপর ছড়ি ঘোরানো নয়, আমাদের এখনকার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য, এর অর্থ হওয়া উচিত ভবিষ্যতের ক্ষমতা, নিজের লোভ লালসা, হিংসা প্রশমিত করার ক্ষমতা, অপরের দুঃখকষ্ট ঘোচানো, অন্যের প্রতি গুরুত্ব ও যত্নবান হওয়ার ক্ষমতা, সুবিচার ও নৈতিকতার জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও অন্যের প্রতি সহানুভূতির লক্ষ্যে আত্মিক বিকাশ অর্জনের ক্ষমতা।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এক নিরন্তর ও গতিশীল প্রক্রিয়া। তাদের দমিয়ে রাখার কাঠামো ও ভাবাদর্শকে বদলে ফেলতে তা মহিলাদের সামর্থ্য বাড়ায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বিষয় সম্পদে নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে তাদের সাহায্য করে এই প্রক্রিয়া, নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে আরও ক্ষমতা জোগায়, সক্ষম করে আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন অর্জনে। এ প্রক্রিয়া আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম পেতে সমর্থ করে, ফলত, তাদের নিজেদের তথা সামাজিক সত্তার বিকাশ ঘটে।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া হচ্ছে এক রাজনৈতিক পদ্ধতি, কেন না এর লক্ষ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সমীকরণ বদলে ফেলা।

কেবলমাত্র শ্রেণি কাঠামোগত লিঙ্গ সম্পর্ক পরিবর্তন করা মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। বরং শ্রেণি, জাতপাত, গোষ্ঠী, জাতি ও উত্তর-দক্ষিণ সমাজের যাবতীয় শ্রেণি কাঠামোগত সম্পর্ক বদলে ফেলাই এর লক্ষ্য হওয়া সমীচীন। অন্যান্য ব্যবস্থা ও শ্রেণি কাঠামোর বদল ব্যতিরেকে কেউ লিঙ্গ শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা লিঙ্গ সম্পর্ক কোনও শূন্য স্থানে কাজ করে না। এই নারী-পুরুষ সম্বন্ধ অন্যান্য সব অর্থনৈতিক,সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এসব ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত।

প্রকৃতির ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক সব মানুষ ও দেশের ক্ষমতায়ন থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন পৃথক নয় এবং হতে পারে না। সমাজের গণতন্ত্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আন্দোলন এবং শান্তি আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তাই মহিলাদের লড়াই ও আন্দোলনের গভীর যোগাযোগ থাকা জরুরি। এসব ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন হচ্ছে একই লড়াইয়ের পৃথক পৃথক দিক, একই স্বপ্নের বিভিন্ন অংশ। সেজন্য এদের নিজেদের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ ও জোট থাকা চাই।

আমার বিশ্বাস, মহিলাদের ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ে কথা বলার সময়ে নারীবাদী চিন্তাভাবনা ও ভাবাদর্শ, সমতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং স্থায়িত্বের ক্ষমতায়ন সম্পর্কেও মুখ খোলা দরকার। অসমর্থ মহিলা মাত্রই আমাদের সমর্থন পাবেন তা নয়। তার বক্তব্য যাচাই করে তবে ঠিক করা দরকার আমরা তাকে সমর্থন করব কি না? মহিলা স্বৈরতন্ত্রী, মহিলা প্রাধান্য বিস্তারকামী, জাতপাতের পক্ষপাতী মহিলা—নারী বলেই আমরা তাদের ক্ষমতায়নে সায় দিই না। আমরা একথা মানি মহিলারাও আধিপত্যকামী হতে পারেন। পক্ষান্তরে, পিতৃতান্ত্রিক ও অন্যান্য শ্রেণি কাঠামোগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে শামিল হতে পারেন কিছু পুরুষ মানুষও। বস্তুত, এই সংগ্রামে অংশীদার পুরুষদের একাংশও। আমাদের লড়াই হচ্ছে কিছু নীতির জন্য এবং এমন এক সমাজের জন্য যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার থাকবে সমান সুযোগ।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

মহানাগরিক হিসাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দায়িত্ব পালন করে গেছেন

সমগ্র পৃথিবীর কাছে তিলোত্তমা কলকাতার একটা আলাদা পরিচয় রয়েই গেছে। আর আমাদের কাছে স্বপ্নের নগর বলা হয়। বর্তমানে তার প্রেক্ষাপটের অনেক বদল হয়েছে। কলকাতার ৫নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে রয়েছে কলকাতা পৌর নিগম। এই পৌর নিগমের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের নামটা রয়ে গেছে। তিনি প্রথম মেয়র হিসাবে কলকাতা পৌর নিগমের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ১৯২৪ সালে এবং সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রথম চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের পিতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। কলকাতা পৌরসভার মেয়র হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করে গেছেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনিও এই কলকাতা পৌর নিগমের মেয়র হিসাবে অলঙ্কৃত করে গেছেন। শরৎচন্দ্র বসু ১৯২৪ সালে কলকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। হেমপ্রভা মজুমদার কলকাতা পুরনিগমের অল্ডারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৪৪ সালে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং এই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বহুবার কারাবাসে গিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় তিনি এগিয়ে এসেছিলেন স্বাধীন ভারতকে দেশবাসীর কাছে তুলে দিতে। ১৮৮৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে তিনি প্রয়াত হন। কলকাতা পৌরসভা যা আজ পৌরনিগম হিসাবে কলকাতাকে পরিষেবা দিয়ে চলেছে এবং সেই কলকাতার পৌর নিগমের অধীনে। আজ তিলোত্তমা কলকাতা আরও সুন্দরময় হয়ে উঠেছে। এই তিলোত্তমা কলকাতা ৩২৭ বছরে পড়ে গেল। আজ যখন গল্পে উঠে আসে ১৭১৭ সালে এই কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে কয়েকটা মেটে বাড়ি নিয়ে, একটা পাড়াগাঁর মতো জায়গা ছিল। আজকের গড়ের মাঠ তখন জলা, ধানের জমি, বাঁশঝাড় আর জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তখনই ১৮২৭ সালে কলকাতায় একটা সমিতি বা কর্পোরেশন গড়া হয়েছিল। এর কর্তা যিনি হবেন তিনিই হবেন মেয়র।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া -৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়... সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড
স্কিম-এলভি, কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড
স্কিম-এলভি, কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়